নবী কাহিনীঃ ১৫তম

১০ম পর্ব (শেষ)

হযরত মূসা আ ও হযরত হারূণ আ

আসসালামু’আলাইকুম

ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters’Forum In Islam

মূসা ও খিযিরের কাহিনী

এ ঘটনাটি বনু ইস্রাঈলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বরং ঘটনাটি ব্যক্তিগতভাবে মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে জড়িত। পিতা ইবরাহীম (আঃ) সহ বড় বড় নবী-রাসূলগণের জীবনে পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। মূসা (আঃ)-এর জীবনে এটাও ছিল অনুরূপ একটি পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে। আনুষঙ্গিক বিবরণ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাটি তীহ্ প্রান্তরের উন্মুক্ত বন্দীশালায় থাকাকালীন সময়ে ঘটেছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ হ'তে. বুখারী হা/৪৭২৫-২৭ প্রভৃতি; 'তাফসীর' অধ্যায় ও অন্যান্য; মুসলিম, হা/৬১৬৫ 'ফাযায়েল' অধ্যায় ৪৬ অনুচ্ছেদ।

এবং সূরা কাহফ ৬০ হ'তে ৮২ পর্যন্ত ২৩টি আয়াতে বর্ণিত বিবরণ থেকে যা জানা যায়, তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে বিবৃত হ'ল।–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একদিন হযরত মূসা (আঃ) বনু ইস্রাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকদের মধ্যে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি? ঐ সময়ে যেহেতু মূসা ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর জানা মতে আর কেউ তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন না, তাই তিনি সরলভাবে 'না' সূচক জবাব দেন। জবাবটি আল্লাহর পসন্দ হয়নি। কেননা এতে কিছুটা অহংকার প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁর উচিৎ ছিল একথা বলা যে, 'আল্লাহই সর্বাধিক অবগত'।

আল্লাহ তাঁকে বললেন, 'হে মূসা! দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী'। একথা শুনে মূসা (আঃ) প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে ঠিকানা বলে দিন, যাতে আমি সেখানে গিয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি'।

আল্লাহ বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের (সম্ভবতঃ লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থল) দিকে সফরে বেরিয়ে পড়। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি জীবিত হয়ে বেরিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সেই বান্দার সাক্ষাৎ পাবে'। মূসা (আঃ) স্বীয় ভাগিনা ও শিষ্য (এবং পরবর্তীকালে নবী) ইউশা' বিন নূনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সাগরতীরে পাথরের উপর মাথা রেখে দু'জন ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ সাগরের ঢেউয়ের ছিটা মাছের গায়ে লাগে এবং মাছটি থলের মধ্যে জীবিত হয়ে নড়েচড়ে ওঠে ও থলে থেকে বেরিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। ইউশা' ঘুম থেকে উঠে এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু মূসা (আঃ) ঘুম থেকে উঠলে তাঁকে এই ঘটনা বলতে ভুলে গেলেন।

অতঃপর তারা আবার পথ চলতে শুরু করলেন এবং একদিন একরাত চলার পর ক্লান্ত হয়ে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য বসলেন। অতঃপর মূসা (আঃ) নাশতা দিতে বললেন। তখন তার মাছের কথা মনে পড়ল এবং ওযর পেশ করে আনুপূর্বিক সব ঘটনা মূসা (আঃ)-কে বললেন এবং বললেন যে, 'শয়তানই আমাকে একথা ভুলিয়ে দিয়েছিল' (কাহফ ১৮/৬৩)। তখন মূসা (আঃ) বললেন, ঐ স্থানটিই তো ছিল আমাদের গন্তব্য স্থল।

ফলে তাঁরা আবার সেপথে ফিরে চললেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, একজন লোক আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মূসা (আঃ) তাকে সালাম করলেন। লোকটি মুখ বের করে বললেন, এদেশে সালাম? কে আপনি? বললেন, আমি বনু ইস্রাঈলের মূসা। আপনার কাছ থেকে ঐ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ আপনাকে বিশেষভাবে দান করেছেন'।

খিযির বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না হে মূসা! আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা তিনি আপনাকে দেননি। পক্ষান্তরে আপনাকে তিনি যে জ্ঞান দান করেছেন, তা আমাকে দেননি'।
মূসা বললেন, 'আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না' (কাহফ ১৮/৬৯)।
খিযির বললেন, 'যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি'।

(১) অতঃপর তাঁরা চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য একটা নৌকা পেলেন। অতঃপর নৌকা থেকে নামার সময় তাতে ছিদ্র করে দিলেন। শারঈ বিধানের অধিকারী নবী মূসা বিষয়টিকে মেনে নিতে পারলেন না। কেননা বিনা দোষে অন্যের নৌকা ছিদ্র করে দেওয়া স্পষ্টভাবেই অন্যায়। তিনি বলেই ফেললেন, 'নিশ্চয়ই আপনি একটা গুরুতর মন্দ কাজ করলেন'। তখন খিযির বললেন, আমি কি পূর্বেই বলিনি যে, 'আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না'। মূসা ক্ষমা চাইলেন। ইতিমধ্যে একটা কালো চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল।
সে দিকে ইঙ্গিত করে খিযির মূসা (আঃ)-কে বললেন, ' ما غمس هذا العصفور منقاره إلا مقدار علمي و علمك و علم الخلائق في علم الله
আমার ও আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের জ্ঞান মিলিতভাবে আল্লাহর জ্ঞানের মুকাবিলায় সমুদ্রের বুক থেকে পাখির চঞ্চুতে উঠানো এক ফোঁটা পানির সমতুল্য'।বুখারী হা/৪৭২৭।

(২) তারপর তাঁরা সমুদ্রের তীর বেয়ে চলতে থাকলেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁরা সাগরপাড়ে খেলায় রত একদল বালককে দেখলেন। খিযির তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও বুদ্ধিমান ছেলেটিকে ধরে এনে নিজ হাতে তাকে হত্যা করলেন। এ দৃশ্য দেখে মূসা আৎকে উঠে বললেন, একি! একটা নিষ্পাপ শিশুকে আপনি হত্যা করলেন? এ যে মস্তবড় গোনাহের কাজ'। খিযির বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না'। মূসা আবার ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, 'এরপর যদি আমি কোন প্রশ্ন করি, তাহ'লে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না' (কাহফ ১৮/৭৫)।

(৩) ‘অতঃপর তারা চলতে লাগলেন। অবশেষে যখন একটি জনপদে পৌঁছলেন, তখন তাদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেয়ে সেটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তখন মূসা বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন’।

খিযির বললেন ‘ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হ’ল। এখন যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, আমি সেগুলির তাৎপর্য বলে দিচ্ছি’ (কাহফ ১৮/৭৮)।
এরপর খাদির উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে বর্ণনা করে বললেনঃ (ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا) অর্থাৎ এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো আপনি দেখে ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ মূসা আলাইহিস সালাম যদি আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরো কিছু জানা যেত। [বুখারীঃ ১২২, মুসলিমঃ ২৩৮০]

এই দীর্ঘ হাদীসে পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মূসা বলতে বনী-ইসরাঈলের নবী মূসা ’আলাইহিস সালাম ও তার যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা ইবন নুন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বান্দার কাছে মূসা আলাইহিস সালাম-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন খাদির ‘আলাইহিস সালাম। [ফাতহুল কাদীর]
খাদির ‘আলাইহিস সালাম যে জনপদে পৌছেন এবং যার অধিবাসীরা তার আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় সে গ্রামটি সম্পর্কে বলা হয়েছে- ‘কৃপণ জনগোষ্ঠী সম্বলিত গ্রামে এসে পৌছলো।’ [মুসলিমঃ ২৩৮০, ১৭২] সুনির্দিষ্ট কোন গ্রামের উল্লেখ করা হয়নি।

একবার নাজদাহ হারুরী (খারেজী) ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখল যে, খাদির ‘আলাইহিস সালাম নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আববাস জবাব লিখলেনঃ কোন বালক সম্পর্কে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, যা খাদির ‘আলাইহিস সালাম-এর অর্জিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যও নাবালেগ হত্যা করা জায়েয হয়ে যাবে। [মুসলিম: ১৮১২] উদ্দেশ্য এই যে, খাদির ‘আলাইহিস সালাম ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর নবুওয়াত বন্ধ হয়ে যাবার কারণে এখন এই জ্ঞান আর কেউ লাভ করতে পারবে না।

উক্ত প্রকার সৃষ্টিগত কর্ম সম্পাদনের কারণেই কিছু বিদ্বানদের ধারণা যে, খাযির মানুষ ছিলেন না। আর এই জন্যই তাঁরা এ বিতর্কের ঝামেলায় যান না, তিনি রসূল ছিলেন, নবী ছিলেন, নাকি ওলী ছিলেন। কারণ এ সকল মর্যাদা কেবল মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁরা বলেন, তিনি ফিরিশতা ছিলেন। কিন্তু যদি আল্লাহ কোন নবীকে সৃষ্টিগত কিছু বিষয়ের জ্ঞান দান করে ওই শ্রেণীর কোন কাজ করিয়ে নেন, তাহলে তা অসম্ভব কিছুই নয়। যখন অহীপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজেই তা পরিষ্কার করে দেন যে, আমি এটা আল্লাহর আদেশে করেছি। সুতরাং যদিও তা শরীয়ত-বিরোধী বলে মনে হয়, তবুও যেহেতু এর সম্পর্ক সৃষ্টিগত বিষয়ীভূত জ্ঞানের সাথে, সেহেতু জায়েয-নাজায়েযের বিতর্ক ওঠার কথা নয়। যেমন সৃষ্টিগত নিয়মানুসারে কেউ অসুস্থ হয়, কেউ মৃত্যু বরণ করে, কারো ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়, কোন জাতির উপর আযাব আসে; এ সবের মধ্যে কিছু কিছু কাজ কোন কোন সময় আল্লাহর আদেশে ফিরিশতারা করে থাকেন। যেভাবে এ সমস্ত কাজ আজ পর্যন্ত কারো শরীয়ত-বিরোধী বলে মনে হয়নি, সেইভাবে খাযির দ্বারা সংঘটিত কাজগুলো শরীয়তের দাঁড়িপাল্লায় মাপা উচিত নয়। তবে বর্তমানে নবুঅত ও অহীর পরম্পরা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কারো পক্ষে এ সমস্ত জিনিসের দাবী কোনক্রমেই সত্য বলে মেনে নেওয়ার মত নয়; যেমন খাযির কর্তৃক প্রমাণিত। কারণ খাযিরের কর্মসমূহ কুরআন হতে সাব্যস্ত; আর সেই কারণে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু এখন কেউ এ রকম কর্মকান্ড ঘটালে বা ঘটাবার দাবী করলে তার প্রতিবাদ করা জরুরী। কারণ তার দাবীর প্রমাণে সেই নিশ্চিত সত্য জ্ঞান আজ অবর্তমান; যার দ্বারা তার দাবীর বাস্তবিকতা প্রমাণ হতে পারে ।

Sisters'Forum In Islam

ঘটনা তিনটির জবাব খিজির আ দিয়েছিলেন—(সূরা কাহাফ ৭৯-৮২)

৭৯. নৌকাটির ব্যাপার– এটা ছিল কিছু দরিদ্র ব্যক্তির, ওরা সাগরে কাজ করত।; আমি ইচ্ছে করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগ করে প্রত্যেকটি ভাল নৌকা ছিনিয়ে নিত।

*** অর্থাৎ এর দ্বারা সমুদ্রে কাজ করে জীবিকার তালাশ করত। [মুয়াস্সার]

৮০. আর কিশোরটি— তার পিতামাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমরা আশংকা করলাম যে, সে সীমালঙ্ঘন ও কুফরীর দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠা করে তুলবে।

৮১. তাই আমরা চাইলাম যে, তাদের রব যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় উত্তম ও দয়া-মায়ায় ঘনিষ্ঠতর

*** হাদীসে এসেছেঃ যে বালককে খাদির 'আলাইহিস সালাম হত্যা করেছিলেন, সে কাফের হিসেবে লিখা হয়েছিল। যদি বড় হওয়ার সুযোগ পেত তবে পিতা-মাতাকে কুফরী ও সীমালংঘনের মাধ্যমে কষ্ট দিয়ে ছাড়ত। [মুসলিমঃ ২৬৬১

৮২. আর ঐ প্রাচীরটি— সেটা ছিল নগরবাসী দুই ইয়াতিম কিশোরের এবং এর নীচে আছে তাদের গুপ্তধন আর তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। কাজেই আপনার রব তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছে করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আর আমি নিজ থেকে কিছু করিনি; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা।

খাদির ‘আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে ইয়াতীম বালকদের জন্য রক্ষিত গুপ্তধনের হেফাযত এজন্য করানো হয় যে, তাদের পিতা একজন সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ তা’আলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে এ ব্যবস্থা করেন। [ইবন কাসীর]

বড় যুলুম থেকে বাঁচানোর জন্য কারু উপরে ছোট-খাট যুলুম করা যায়। যেমন নৌকা ছিদ্র করা থেকে এবং বালকটিকে হত্যা করা থেকে প্রমাণিত হয়। তবে শরী‘আতে মুহাম্মাদীতে এগুলি সবই সামাজিক বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ করে হত্যাকান্ডের মত বিষয় একমাত্র রাষ্ট্রানুমোদিত বিচার কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কারু জন্য অনুমোদিত নয়।

(২) পিতা-মাতার সৎকর্মের ফল সন্তানরাও পেয়ে থাকে। যেমন সৎকর্মশীল পিতার রেখে যাওয়া গুপ্তধন তার সন্তানরা যাতে পায়, সেজন্য খিযির সাহায্য করলেন। তাছাড়া এ বিষয়েও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলেম ও সৎকর্মশীলগণের সন্তানদের প্রতি সকলেরই স্নেহ পরায়ণ হওয়া কর্তব্য।

(৩) মানুষ অনেক সময় অনেক বিষয়কে ভাল মনে করে। কিন্তু সেটি তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,
عَسَى أَن تَكْرَهُوْا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوْا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون- (البقرة ২১৬)-

‘তোমরা অনেক বিষয়কে অপসন্দ কর। অথচ সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার অনেক বিষয় তোমরা ভাল মনে কর, কিন্তু সেটি তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্ত্ততঃ আল্লাহই প্রকৃত অবস্থা জানেন, তোমরা জানো না’ (বাক্বারাহ ২/২১৬)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ لايَقْضِى اللهُ للمؤمن من قضاءٍ الا كان خيرًا له আল্লাহ তার মুমিন বান্দার জন্য যা ফায়ছালা করেন, তা কেবল তার মঙ্গলের জন্যই হয়ে থাকে’। আহমাদ হা/১২৯২৯ ‘সনদ ছহীহ, -আরনাঊত্ব।

(৪) অতঃপর আরেকটি মৌলিক বিষয় এখানে রয়েছে যে, মূসা ও খিযিরের এ শিহরণমূলক কাহিনীটি ছিল ‘আগাগোড়া একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের বহিঃপ্রকাশ’। থলের মধ্যেকার মরা মাছ জীবিত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সাগরে চলে যাওয়া যেমন সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত বিষয়, তেমনি আল্লাহ পাক কোন ফেরেশতাকে খিযিরের রূপ ধারণ করে মূসাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যও পাঠিয়ে থাকতে পারেন। যাকে তিনি সাময়িকভাবে শরী‘আতী ইলমের বাইরে অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যা মূসার জ্ঞানের বাইরে ছিল। এর দ্বারা আল্লাহ মূসা সহ সকল মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

(৫) বান্দার জন্য যে অহংকার নিষিদ্ধ, অত্র ঘটনায় সেটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয়।

সূরা কাহাফ(আয়াত নং ৬০-৮২) নবী মুসা (আ) এর সাথে একজন প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী ব্যক্তির কথোপকথন নিয়ে। মুসা (আ) নিজের বাহ্যিক জ্ঞান আর দৃষ্টি দিয়েই সবকিছু বিচার করতেন। এবং ভাবতেন তিনি অনেক জ্ঞানী। তাই উনার ভুল ভাঙ্গাতে উনাকে এক জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে আল্লাহ দেখা করতে বলেন। সেই প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী ব্যক্তি যাই করেন, মুসা (আ) এর কাছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাই ভুল মনে হয়। শেষে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের কাজগুলোর ব্যাখ্যা মুসাকে (আ) বুঝিয়ে বলেন। হতভম্ব মুসা (আ) বুঝতে পারেন বাহ্যিক জ্ঞানের পাশাপাশি অন্তর্জ্ঞান না থাকলে ভ্রান্তি আর সত্যের ফারাক বুঝা যায় না কখনোই।

এই ঘটনার সাথে দাজ্জালের সম্পর্কটা কী? আল্লাহ এর মাধ্যমে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন দাজ্জালের সময়ে মানুষ শুধু বাহ্যিক জ্ঞানকেই অর্থাৎ চর্মচক্ষুর পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বস্তুবাদী জ্ঞানকেই শুধু মূল্যায়ন করবে, আর অন্তর্চক্ষুর অন্ধত্বের ফলে অন্তর্জ্ঞানহীন হয়ে গিয়ে অন্ধ আর দাজ্জালের মতোই এক চোখা (ম্যাটেরিয়ালিস্টিক) হয়ে যাবে। সত্য মিথ্যা আলাদা করতে পারবে না। তাই অন্তর্জ্ঞান থাকাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সবচাইতে সরাসরি বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎসে (তথা আল-কুরআনে) ফিরে যাওয়া, নিজের ঈমান রক্ষার জন্যে, খাঁটিটা চেনার জন্যে।

খিযির কে ছিলেন?

বুখারীর হাদীসে তার নাম "খাদির" উল্লেখ করা হয়েছে। খাদির অর্থ "সবুজ শ্যামল" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরূপই হোক না কেন। [বুখারীঃ ৩৪০২]।

কুরআনে তাঁকে

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ১৮:৬৫

এরপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমাদের বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে আমরা আমাদের কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। কাহাফঃ৬৫

সেখানে তাঁকে নবী বলা হয়নি। জনশ্রুতি মতে তিনি একজন ওলী ছিলেন।

জিহাদের আদেশ অমান্য করার শাস্তি স্বরূপ মিসর ও শামের মধ্যবর্তী তীহ প্রান্তরে চল্লিশ বছর যাবত উন্মুক্ত কারাগারে অতিবাহিত করার পর মূসার শিষ্য ও ভাগিনা এবং পরবর্তীতে নবী ইউশা‘ বিন নূনের নেতৃত্বে জিহাদ সংঘটিত হয় এবং আমালেক্বাদের হটিয়ে তারা ফিলিস্তীন দখল করে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তারা পুনরায় বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয় এবং নানাবিধ অনাচারে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ তাদের উপরে পুনরায় আমালেক্বাদের চাপিয়ে দেন। বনু ইস্রাঈলরা আবার নিগৃহীত হ’তে থাকে। এভাবে বহু দিন কেটে যায়।
এক সময় শ্যামুয়েল ((شمويل নবীর যুগ আসে। লোকেরা বলে আপনি আমাদের জন্য একজন সেনাপতি দানের জন্য আল্লাহর নিকট দো‘আ করুন, যাতে আমরা আমাদের পূর্বের ঐতিহ্য ফিরে পাই এবং বর্তমান দুর্দশা থেকে মুক্তি পাই।

সংশয় নিরসন

(1) মূসা (আঃ)-এর সিন্দুক ও নবীগণের ছবি :

বাক্বারাহ ২৪৮ : ‘ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ তাদের নবী (শ্যামুয়েল) তাদেরকে বললেন (ত্বালূতের) রাজা হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকটে সেই ‘তাবূত’ (সিন্দুক) আসবে...।’
এখানে তাবূত-এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসিরে বর্ণিত কোন ব্যাখ্যাই কুরআন ও হাদীছ সম্মত নয়। বরং প্রকৃত কথা এই যে, এটি হ’ল আল্লাহর হুকুম মোতাবেক মূসা (আঃ)-এর তৈরী সেই সিন্দুক, যার মধ্যে তাঁর লাঠি, তাওরাত এবং তাঁর ও হারূণ (আঃ)-এর পরিত্যক্ত অন্যান্য পবিত্র বস্তুসমূহ সংরক্ষিত ছিল। বনু ইস্রাঈলগণ এটিকে বরকত হিসাবে ও বিজয়ের নিদর্শন হিসাবে মনে করত।

(২) তাওরাতের পৃষ্ঠা সমূহ :

আ‘রাফ ১৪৫ : ‘ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ আমরা তার (মূসা) জন্য ফলকে (তাওরাতে পৃষ্ঠাসমূহে) সকল বিষয়ে উপদেশ ও স্পষ্ট ব্যাখ্যাসমূহ লিখে দিয়েছি’। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে, أي ألواح التوراة وكانت من سدر الجنة أو زبرجد أو زمرد سبعة أو عشرة ‘ অর্থাৎ তাওরাতের ফলক সমূহ, যা ছিল জান্নাতের পত্র সমূহ বা যবরজাদ অথবা যুমুর্রুদ, যা ছিল ৭টি অথবা ১০টি’। অথচ এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। ঐ ফলকগুলির সংখ্যা কত ছিল, কি দিয়ে তৈরী ছিল, কতটুকু তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল, কি দিয়ে ও কিভাবে সেখানে লেখা ছিল, এগুলি বিষয় জানা বা তার উপরে ঈমান আনার কোন বাধ্যবাধকতা আমাদের উপরে নেই। কুরআন-হাদীছ এবিষয়ে চুপ রয়েছে। আমরাও এ বিষয়ে চুপ থাকব। বস্তুতঃ এগুলি স্রেফ ইস্রাঈলী কল্পকাহিনী মাত্র।

মূসা ও ফেরাঊনের কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

১. আল্লাহ যালেম শাসক ও ব্যক্তিদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা সংশোধিত না হ'লে সরাসরি আসমানী বা যমীনী গযব প্রেরণ করেন অথবা অন্য কোন মানুষকে দিয়ে তাকে শাস্তি দেন ও যুলুম প্রতিরোধ করেন। যেমন আল্লাহ উদ্ধত ফেরাঊনের কাছে প্রথমে মূসাকে পাঠান। ২০ বছরের বেশী সময় ধরে তাকে উপদেশ দেওয়ার পরেও এবং নানাবিধ গযব পাঠিয়েও তার ঔদ্ধত্য দমিত না হওয়ায় অবশেষে সাগরডুবির গযব পাঠিয়ে আল্লাহ তাদেরকে সমূলে উৎখাত করেন।

২. দুনিয়াদার সমাজনেতারা সর্বদা যালেম শাসকদের সহযোগী থাকে। পক্ষান্তরে মযলূম দ্বীনদার ব্যক্তিগণ সর্বদা দ্বীনদার সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী থাকে।

৩. দুনিয়া লোভী আন্দোলন নিজেকে অপদস্থ ও সমাজকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে আখেরাত পিয়াসী আন্দোলন নিজেকে সম্মানিত ও সমাজকে উন্নত করে। যেমন দুনিয়াদার শাসক ফেরাঊন নিজেকে ও নিজের সমাজকে ধ্বংস করেছে এবং নিজে এমনভাবে অপদস্থ হয়েছে যে, তার নামে কেউ নিজ সন্তানের নাম পর্যন্ত রাখতে চায় না। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ)-এর দ্বীনী আন্দোলন তাঁকে ও তাঁর ঈমানদার সাথীদেরকে বিশ্ব মাঝে স্থায়ী সম্মান দান করেছে।

৪. দুনিয়াতে যালেম ও মযলূম উভয়েরই পরীক্ষা হয়ে থাকে। যালেম তার যুলুমের চরম সীমায় পৌঁছে গেলে তাকে ধ্বংস করা হয়। অনুরূপভাবে মযলূম সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা করলে নির্দিষ্ট সময়ে তাকে সাহায্য করা হয়। অধিকন্তু পরকালে সে জান্নাত লাভে ধন্য হয়।

৫. দ্বীনদার সংস্কারককে সর্বদা আল্লাহর সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল থাকতে হয় এবং কথায় ও আচরণে সামান্যতম অহংকার প্রকাশ করা হ'তে বিরত থাকতে হয়। মূসা ও খিযিরের ঘটনায় আল্লাহ এ প্রশিক্ষণ দিয়ে সবাইকে সেকথা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মূসা ও ফেরাঊনের কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

৬. অহীর বিধানের অবাধ্যতা করলে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত জাতিও চিরস্থায়ী গযবের শিকার হ'তে পারে। বনু ইস্রাঈলগণ তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। নবীগণের শিক্ষার বিরোধিতা করায় তাদের উপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে যায় এবং তারা চিরস্থায়ী গযব ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটি একইভাবে প্রযোজ্য। ইস্রাঈলী দরবেশ আলেম বাল'আম বা'ঊরার ঘটনা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৭. জিহাদ বিমুখ জাতি কখনোই সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে দুনিয়ায় বাঁচতে পারে না। আর সেকারণেই মিসরীয় জনগণের ১০ হ'তে ২০ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলগণকে রাতের অন্ধকারে সেদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়। অতঃপর জিহাদে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় তারা তাদের পিতৃভূমি বায়তুল মুক্বাদ্দাস অধিকারে ব্যর্থ হয়। যার শাস্তি স্বরূপ দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত তীহ প্রান্তরের উন্মুক্ত কারাগারে তারা বন্দীত্ব বরণে বাধ্য হয়। অবশেষে নবী ইউশা-র নেতৃত্বে জিহাদ করেই তাদের পিতৃভূমি দখল করতে হয়।

৮. সংস্কারককে জাতির নিকট থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। দুনিয়ায় তাঁর নিঃস্বার্থ সঙ্গী হাতে গণা কিছু লোক হয়ে থাকে। তাঁকে স্রেফ আল্লাহর উপরে ভরসা করেই চলতে হয়। বিনিময়ে তিনি আখেরাতে পুরস্কৃত হন ও পরবর্তী বংশধরের নিকটে যুগ যুগ ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন। যেমন মূসার প্রকৃত সাথী ছিলেন তার ভাই হারূণ ও ভাগিনা ইউশা' বিন নূন। বাকী অধিকাংশ ছিল তাকে কষ্ট দানকারী ও স্বার্থপর সাথী ।

মূসা (আঃ) তাই দুঃখ করে তার কওমকে বলেন,

আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র রাসূল অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (ছফ ৬১/৫)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, মালাকুল মউত মূসা (আঃ)-এর নিকট আসেন তাঁর জান কবয করার জন্য। তখন তিনি তাকে থাপ্পড় মারেন। ফলে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তখন মালাকুল মউত তার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং বলেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন, যিনি মরতে চান না। আল্লাহ তার চোখ ফিরিয়ে দেন এবং বলেন, তুমি পুনরায় যাও এবং তাকে বল, আপনি কতদিন বাঁচতে চান? অতঃপর তুমি একটি ষাঁড়ের দেহে হাত রেখে বলবে, এর মধ্যে যত লোম আছে ততদিন আপনার হায়াত বৃদ্ধি করা হবে। তিনি বললেন, অতঃপর কি হবে? তিনি বললেন, আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। তখন মূসা বললেন, তাহ'লে এখুনি হৌক। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে একটি ঢিল ছোঁড়ার দূরত্বে নিয়ে যাও। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! যদি আমি সেখানে থাকতাম, তাহ'লে আমি তোমাদেরকে রাস্তার ধারে সেই লাল ঢিবির স্থানটি দেখিয়ে দিতাম' (বুখারী হা/৩৪০৭; মুসলিম হা/২৩৭২; মিশকাত হা/৫৭১৩)।

মৃত্যু সম্ভবতঃ ৮০ থেকে ১০০ বছর বয়সের মধ্যে। মূসা (আঃ)-এর কবর হয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে।

মূসা ও হারূণ (আলাইহিমাস সালাম)-এর দীর্ঘ কাহিনীর মাধ্যমে নবীদের কাহিনীর একটা বিরাট অংশ সমাপ্ত হ'ল। হারূণ ও মূসার জীবনীতে ব্যক্তি মূসা ও গোষ্ঠী বনু ইস্রাঈলের উত্থান-পতনের যে ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে, তা রীতিমত বিস্ময়কর ও শিহরণ মূলক। একই সাথে তা মানবীয় চরিত্রের তিক্ত ও মধুর নানাবিধ বাস্তবতায় মুখর। সমাজ সংস্কারক ও সমাজ সচেতন যেকোন পাঠকের জন্য এ কাহিনী হবে খুবই শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যমন্ডিত। এক্ষণে আমাদের উচিত হবে এর আলোকে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হওয়া এবং গভীর ধৈর্যের সাথে আমাদের স্ব স্ব পরিবার, সমাজ ও জাতিকে অহি-র বিধানের আলোকে গড়ে তোলা। আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন!

Sisters'Forum In Islam